পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা: আমরা এবং আমাদের আগামীর প্রজন্ম

আনিশাহ্ বিলকিছ

ড. তারেক শামসুর রেহমানের মতো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রাজনীতি-আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতির গবেষকের মৃতদেহ ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে পুলিশের উদ্ধার এবং কবরীর মতো একজন স্বনামধন্য নায়িকা, বহুল পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একাকিত্বের দীর্ঘশ্বাস– [আমার একটা দুঃখ রয়ে গেল, জীবনে আমি একজন ভালো বন্ধু পেলাম না, ভালো স্বামী পেলাম না। সন্তানেরা অনেকটা যার যার মতো করে আছে। কিন্তু সঙ্গ দেওয়ার মতো একজন ভালো মানুষ আমি পাই নি, যাকে বলতে পারি এসো, এক কাপ চা খাই গল্প করি। -অধুনা] আপনাদেরকে শঙ্কিত করছে কি না আমি জানি না, তবে আমাকে নাড়া দিয়েছে, ভাবাচ্ছে। খুব গভীরভাবে ভাবাচ্ছে আমাদের প্রজন্মের জন্য, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য!

আমি বোধহয় কোনোখানে দেখে থাকব, অনেক দেশেই নাকি রোগীর অবস্থা মারাত্মক হয়ে গেলে গ্লাসে হালকা গরম পানি দিয়ে এমন করে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে রোগী বুঝতে পাওে, তার আপনজন শেষযাত্রায় তার হাত ধরে আছে। ভাবা যায়, আপনজনের স্পর্শ কতটা দামী! তাহলে এখন ভাবুন, তো কত দামের বিনিময়ে আমরা কিনছি এই গভীর একাকিত্ব!

আজ দুপুরেই একজন লেখকের সঙ্গে কথা বলছিলাম, কথার মাঝখানে আমি হঠাৎই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বলুন তো, সব থাকতে দেবদাসকে বাইরে গিয়ে মরতে হলো কেন? ভদ্রলোক আমাকে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন, একটা মানুষের জন্যই-বা কেন পথেঘাটে মরতে হবে? আগে বলুন, তারপর আমি উত্তর দিচ্ছি। আমার উত্তর ছিল খানিকটা এরকম–আসলে দেবদাসের জৌলুশময় ঠিকানায় ওইরকম ভালোবাসা ছিল না বললেই চলে। কেবল তার মা এবং চুন্নীলাল ছাড়া। এতসবের মধ্যে খুব সাধারণ মেয়ে পারু তাকে ভালোবাসত। দেবদাস যখন বুঝতে পারে এই ভালোবাসা–যা সে হারিয়ে ফেলেছে–তখনই তার কাছে জীবন তুচ্ছ হয়ে ওঠে; যাপন করতে থাকে নেশায় আসক্ত এক জীবন; এবং তার কাছে ছুটেও চলে যায় কিন্তু বাধ সাধল অসুস্থতা, মৃত্যু।

এখন আসি এ-কথায় যে, এক জনের জন্যই কেন পথেঘাটে মরতে হয়। যাদের পারিবারিক বন্ধন খুব শিথিল, এরা সাধারণত যাদের ভালোবাসে তাদেরকেই একটা পৃথিবী ভেবে বসে। এর পেছনে নানাবিধ কারণও আছে। আবার একটা বয়সের পরে আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোবাসার চেয়ে অর্জিত ভালোবাসার প্রতি ফ্যান্টাসি বেশি কাজ কওে; কারণ আমরা ধরেই নিই জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোবাসা তো আছেই, এখন অর্জিত ভালোবাসাই রক্ষা করাই দায়। আসলেই ভালোবাসার কাছে জীবন খুব তুচ্ছ হয়ে ওঠে কখনো কখনো। সে যাই হোক, দেবদাস যখন বুঝতে পেরেছিল–হয়তো এই যাত্রায় আর রক্ষা হবে না, তখন কিন্তু ফিরতে

চেয়েছিল ভালোবাসার মমতাময়ী মায়ের কাছেই!

যে পরিবার মানুষের সবটা জুড়ে থাকে সেই পারিবারিক জীবন কতটা শিথিল হয়ে গেছে, পরিবার থেকে আমাদের প্রজন্ম কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এখন ভাববার বিষয় এটাই। আমি খুব অবাক হয়ে দেখেছি, করোনাকালীন এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুবান্ধব, সিনিয়র-জুনিয়র অনেকের কোটি কোটি অভিযোগ পরিবারের প্রতি। আবার এমনও না যে সব অভিযোগ অহেতুক, বেশিরভাগই যৌক্তিক। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা শুনেছি তা হলো, আমি বাড়িতে থাকতে থাকতে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। কেন? জিজ্ঞেস করায় অনেকের উত্তর ছিল এরকম–ঝুলে থাকা আমার একাডেমিক লাইফ, প্রেমের বিচ্ছেদ বা ঝামেলা কিংবা নিঃসঙ্গতায় ভুগছি; কিন্তু বাড়িতে নিজের কথাগুলো কাউকে বলতে পারি না প্রাণ খুলে। আমার একমাত্র সঙ্গী 'সোশ্যাল মিডিয়া'। সেখানেও অনেকের ভালো ক্যারিয়ার, লাইফ, বিয়ে কিংবা ভালো সম্পর্ক আমাকে ভাবাচ্ছে, আমি হতাশায় ভুগছি। অথচ আমার পরিবার ভাবছে, বাড়ি আছি, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি আর কি! আসলে শারীরিক স্বাস্থ্যের বাইরেও যে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বলে একটা কথা আছে, এটা বাঙালি পরিবারের কাছে প্রায় অপরিচিত একটা শব্দ।

আবার মহামারিতে পৃথিবী যখন একটা অনিশ্চয়তা নিয়ে চলছে, যে-কারো যেকোনো সময় মৃত্যু হতে পারে একথা জেনেও অনেক তরুণ-তরুণী ঘরে ফিরছে না, ফিরবার প্রয়োজন বোধ করছে না। অন্তত পক্ষে আপনজনদের কাছে গিয়ে মরা তো যেত! অথচ সবার আগে এই মহামারিতে মানুষের আপন ঠিকানা ঘরেই ফেরার কথা ছিল। আবার কেউ কেউ তো নানান রকম চাপ সামলে উঠতে না পেরে আত্মহত্যার মতো দুঃসাহস করে ফেলেছে। তাহলে এই ঘরে না ফেরার কারণ? কারণ তো আছেই–এক, থাকবার জায়গামাত্রই সবার ঘর হয়ে ওঠে না; দুই, পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব; তিন, পাড়াপড়শির কানাঘুষা (যেমন: ভাবী পোলার বয়স হইল চাকরি হয় না, মাইয়া তো বড় হইছে এহনও বিয়া দেন না ইত্যাদি) এবং চার, পরিবার হয়তো তেমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারছে না যেখানে নিজের মতো করে এই সময়টা কাজে লাগানো যায়।

এই অবস্থার শেষে এরাই কেউ কেউ হয়তো একটা রুটিরুজির ব্যবস্থা করে নিবে দেশে, আবার কেউ পাড়ি জমাবে বাইরের দেশে। যারা দেশে থাকবে তাদের অনেকেই নিজ পরিবার, চাকরির দোহাই দিয়ে দায় এড়িয়ে যাবে বাবা-মা-পরিবারের। যারা বাইরের দেশে থাকবে তাদের অবস্থা হয় অনেকটা 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের নায়ক অতীনের (বাবলু) মতো। এদের শিক্ষাজীবনের তীব্র অর্থাভাবের মুক্তি ঘটে, ব্যক্তিজীবনে স্থিরতাও আসে, কিন্তু পারিবারিক বন্ধনে ভৌগোলিক দূরত্বের সঙ্গে চলে আসে একটা মানসিক দূরত্বও। এই উপন্যাসে আমরা দেখি বাবলুর বাবা অসুস্থ থাকলেও সে আমেরিকা থেকে আসতে পারে নি চাকরির অজুহাতে। তার বাবা তীব্র একাকিত্বকে মোকাবিলা করে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। আমাদের বর্তমান সময়টাতেও কি তাই হচ্ছে না!

সফলতার নাম দিয়ে নির্দিষ্ট একটা সীমা বেঁধে দিই, যে তুমি এটা করলে সফল আর না করতে পারলেই জীবন শেষ। ছেলেমেয়েরা করেও তাই, জীবন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়ে কেবল একটা লক্ষ্যাভিমুখী জীবন-যাপন করে। তারপর তার ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও ঘটতে থাকে একই রকম ঘটনা। চলতেই থাকে বৃত্তাকার এই প্রক্রিয়া। এই গৎবাঁধা নিয়মে তথাকথিত সফল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও জীবন-সায়াহ্নের সময়টুকু পার করেন গভীর একাকিত্বে, তারপর হয়তো কোনো একদিন একলা স্বজনহীন ঘরে মরে পরে থাকেন।

আমার মনে হয় আমরা এমন একটা সময়ে চলে এসেছি, যেখানে দৃশ্যত পরিবারের মতো একটা প্রতিষ্ঠান আছে বটে কিন্তু আসলে মানসিকভাবে নেই অতটা। তাই এখনই সময় প্রত্যেক সন্তানকে পারিবারিক শিক্ষা-স্নেহ-শাসন-সম্মান এবং সুস্থ বিনোদনের মধ্য দিয়ে একজন মানবিক মানুষ হিসেবে করে গড়ে তোলা, ডিভাইস নির্ভর তরুণ-তরুণীদেরও উচিত কেবল বস্তুনির্ভর সফলতার চিন্তা না করে আমাদের কাছের মানুষ, প্রিয়জনদের আবেগ-অনুভূতির দাম দিতে শেখা, যেকোনো খারাপ অবস্থায় পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করা। যাতে করে আর একটি সন্তানকেও আর হতাশায় ভুগতে না হয়, আত্মাহুতি দিতে না হয় পারিবারিক সাপোর্টের অভাবে। সেইসঙ্গে আর কোনও বাবা-মারও যেন অন্তিম যাত্রা না হয় প্রবল একাকিত্ব আর গভীর নিঃসঙ্গতায়। সবশেষে একটি মানবিক পৃথিবীর প্রত্যাশা।